

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জাহেলিয়াত সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (صُورٌ مِّنَ الْمُجْتَمَعِ الْعَرَبِيِّ الْجَاهِلِيِّ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

সামাজিক অবস্থা (الْحَالَةُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ):

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন ববসাব করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পরিবারে পুরুষ এবং মহিলাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাঁদের যুক্তি-সঙ্গত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো এবং তাঁদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দেয়া হতো। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত।

তৎকালীন আরবে প্রচলিত রেওয়াজ মারফিক কোন ব্যক্তি নিজের উদারতা কিংবা বীরত্বের প্রশংসাসূচক কোন কিছু বলতে চাইলে মহিলাদের সম্বোধন করেই তা বলা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা ইচ্ছা করতে পারত। পক্ষান্তরে পুরুষদের উত্তেজিত ও উদ্বোধিত করে সহজেই যুদ্ধাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত করে দিতে পারত।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামোই আরবে প্রচলিত ছিল। পরিবার প্রধান বা পরিবারের পরিচালক হিসেবে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হতো। পারিবারিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী এবং সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে কনের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবকগণের অগোচরে ইচ্ছামারফিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মহিলাদের ছিল না।

এক দিকে যখন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা, অপরপক্ষে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশ্লীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তথ্যাদি সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তো সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানুসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধীনস্থ মহিলার জন্য অন্য এক জনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।

নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো ‘নিকাহে ইসতিবযা’। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিদর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব

স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে ‘নিয়োগ’ বলা হয়।

তথাকথিত ‘বিবাহ’ নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘন্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহবানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, ‘আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।’

তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন ‘হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান।’ মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের ‘বিবাহ ও মিলন’ নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রেওয়াজ জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নির্দিষ্ট গমনাগমন করতে পারেন।

যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহ্বান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানপির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, ‘এ সন্তান আপনার’। যাঁকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নব জাতকটির একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশ্লীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম (ﷺ) আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।[1]

আরও কোন কোন ক্ষেত্রে আরবের নারী-পুরুষদের অন্য রকম সম্পর্কের কথা জানা যায়। তৎকালে, অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বন্ধনের ব্যাপারটি এমন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা তলোয়ারের ধার এবং বল্লমের ফলার সাহায্যে প্রতিষ্ঠালাভ করত। এতে গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে বিজয়ী গোত্র বিজিত গোত্রের নারীদের আটক রেখে যৌন সম্বোগে তাদের ব্যবহার করত। এ সকল মহিলার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করত তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে সারা জীবন তাদেরকে খাটো

হয়েই থাকতে হতো।

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। একই সঙ্গে দু’সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة النساء: 22، 23]

‘যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে, সেসব নারীকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। - তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু’ বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।’ (আন-নিসা ৪ : ২২-২৩)

স্ত্রীকে পুরুষদের তালাক প্রদানের অধিকার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল না অতঃপর ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়।[2]

সেই আমলে ব্যভিচারের মতো একটি অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষকেই দেখা যেত। কোন গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এ নারকীয় দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থাকত। অবশ্য এমন কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষও চোখে পড়ত যাঁদের আভিজাত্যানুভূতি ও সম্ভ্রম বোধ পাপাচারের এ পঙ্কিলতা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখত। অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে নারীদের জীবন যাপন করতে হতো। অবশ্য দাসীদের তুলনায় স্বাধীনাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল।

সমাজে দাসীগণকে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হতো। তৎকালীন সমাজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে নানা অনাচার, যথেষ্টাচার ও পাপাচারে লিপ্ত না হতেন। এ সব অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংশয়ের সৃষ্টি হতো না। যেমন ‘সুনানে আবু দাউদ’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে এক দফা এক ব্যক্তি খাড়া হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), অমুক ব্যক্তি আমার পুত্র। অজ্ঞতার যুগে আমি তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলাম।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘ইসলামে এমন দাবীর কোন সুযোগ কিংবা মূল্য নেই। অন্ধকার যুগের যাবতীয় প্রথা পদদলিত ও বিলুপ্ত হয়েছে। এখন পুত্র তাঁরই গণ্য হবে যার স্ত্রী আছে অথবা দাসী আছে। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আবদ ইবনে যাম'আহর মধ্যে যাম'আহর দাসী পুত্র আব্দুর রহমান বিন যাম'আহর ব্যাপারে যে বিবাদ সংঘটিত হয় তা হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং এ ব্যাপারটি অবশ্যই অনেকের জানা কথা।[3]

অন্ধকার যুগে পিতা পুত্রের সম্পর্কও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনটি হয়তো বা বলা সঙ্গত হবে না যে সন্তান বাৎসল্যের ব্যাপারে তাদের কিছুটা ঘাটতি ছিল। নীচের কবিতার চরণটি প্রণিধানযোগ্যঃ

إِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا ** أَكْبَادُنَا تَمْشَى عَلَى الْأَرْضِ

“আমাদের সন্তান আমাদের কলিজার টুকরো, যারা জমিনের উপর চলাফেরা করছে।”

পক্ষান্তরে, কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে নারকীয় দুষ্কর্ম করতে তাঁরা একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। সমাজের লোক লজ্জা ও নিন্দা এবং তাঁদের জন্য ব্যয় নির্বাহের ভয়ে অনটন ও অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পুত্র সন্তানদেরও হত্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام: 151]

“বল, ‘এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা হচ্ছে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর।’ (আল-আন‘আম ৬ : ১৫১)[4]

কিন্তু পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে তার যথার্থতা নির্ণয় করা বা প্রত্যয়ণ করা একটি অত্যন্ত মুশ্কিল ব্যাপার। কারণ, গোত্রীয় বিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় স্বপক্ষকে শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় আপন আপন সন্তানেরাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে প্রামাণিত হতো। এ প্রেক্ষিতে পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্যই আরববাসীগণের কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

অবশ্য এ জনশ্রুতিটি যে কোন ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমনটি বলাও বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ, ক্ষমতালিপ্সা, গোত্রপতিগণের জন্য পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্য কাম্য হতে পারে। কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, নিরীহ গোবেচারার গরীব দুঃখীদের জন্য পুত্র সন্তানের আধিক্য কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ কিংবা দুঃসময়ে পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যতদূর জানা যায় তৎকালীন আরব সমাজে সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই এবং গোষ্ঠী ও গোত্রের লোকজনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হচ্ছে, বহু গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রে গোত্রে রেষারেষিক্রীষ্ট আরব সমাজে গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হতো আরববাসীগণকে। গোত্রের মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা

কুণ্ঠিত হতেন না। গোত্র সমূহের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার মূলতত্ত্ব গোত্রীয় চেতনা এবং আবেগ ও অনুভূতিকে সজীব ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হতো। সাম্প্রদায়িকতা এবং আত্মীয়তাই ছিল গোত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎস। তাঁরা সেই উদাহরণকে শাব্দিক অর্থে বাস্তবে রূপদান করতেন, যেমনঃ

(أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

(নিজ ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক)।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকজনের মধ্যে উৎকট এ গোত্রীয় চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেই সকল ধারণার মূলোৎপাটন করেছে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কেই সাহায্য করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হল তাঁকে অন্যায় ও অনাচার থেকে বিরত রাখা। অবশ্য, মর্যাদা এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অন্যের আগে অগ্রসর হওয়ার যে আকুতি ও আকঙ্খা একই ব্যক্তি কর্তৃক বহুবার তা বাস্তবে পরিণত করতে চাওয়ার কারণেই গোত্র সমূহের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দামামা বেজে উঠত। আওস ও খায়রাজ, আবস ও যুবাইয়ান, বাকর ও তগলিব এবং অন্যান্য গোত্রের সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেমনটি লক্ষ্য করা যায়।

পক্ষান্তরে যতদূর জানা যায়, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গোত্রের সকল ক্ষমতাই ব্যয়িত হতো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে। তবে দ্বীনী ব্যবস্থা এবং অশ্লীল কথনের সংমিশ্রণে গঠিত কতিপয় রীতিনীতি ও অভ্যাসের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেন, সহযোগিতামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত চুক্তি, প্রতিজ্ঞাপত্র এবং আনুগত্যের বিধি বিধান সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় গোত্রগুলো পরস্পর একত্রিত হতেন। সর্বোপরি, হারাম মাসগুলো তাঁদের জীবিকার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক ছিল। এ মাসগুলোতে তারা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিত কেননা এ মাসগুলোতে তারা অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করতো। যেমন আবু রযা 'উতারিদী বলেন, যখন রজব মাস সমাগত হতো তখন আমরা বলতাম, *منصل السنة* তখন এমন কোন তীর বা বর্শা থাকতো না যা অকার্যকর করার জন্য তা থেকে আমরা লোহার ফলক খুলে ফেলতাম না এবং রজব মাসে আমরা এগুলো দূরে নিক্ষেপ করতাম। অন্যান্য হারাম মাসগুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করতো।

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার সারকথা বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে হয় যে স্থিরতা এবং কুপমন্ডুকতাই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞতা, অশ্লীলতা, স্বৈচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র সমাজ। অসত্য ও অন্যায়ের নিকট সত্য ও ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত। সাধারণ মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো পশুর মত। বাজারের পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো মহিলাদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো মাটি ও পাথরের মতো। গোত্র কিংবা রাষ্ট্র যাই বলা হোক না কেন, প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিমত্তা। প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিদ্বারা গণের স্বার্থে। দুর্বলতর শ্রেণীর সাধারণ লোকজনের কল্যাণের কথা কস্মিনকালেও চিন্তা করা হতো না। প্রজাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থসম্পদে কোষাগার ভরে তোলা হতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মহড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা সংরক্ষিত হতো।

[1] সহীহুল বুখারী, “অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না” অধ্যায় ২য় খন্ড ৭৬৯ পৃঃ এবং আবু দাউদ, নেকাহর পদ্ধতিসমূহ অধ্যায়।

[2] আবু দাউদ মুরাযায়াত বাদা ত্বাতালিকাতিস সালাম ৬৫ পৃঃ “আত্তালাকু মার্তানে” সংশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

[3] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৯৯৯, ১০৬৫ পৃঃ, আবু দাউদ “আল আওলাদুলিল ফিরাশ” অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[4] কুরআন মাজীদ : ১৬/৫৮, ৫৯, ১৭/৩১, ৮১।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6058>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন